কোথায় –

[illegible]

[illegible]

পরিবেশনায়

[illegible]

(করোনার রকমারি টিকা এসেই গেল; কিন্তু তা কার্যকরী হবে কিনা এবং সেই টিকা কতটা নিরাপদ হবে, এইসব প্রশ্নের মীমাংসা হচ্ছে না। অথচ তাড়াহুড়ো বজায় থাকছে। তাই প্রশ্ন জাগে, কোনও 'অন্যায় শৌখিনতায়' কি আমাদের মন হারিয়ে যাচ্ছে? মৃত্যু নিয়ে উৎকণ্ঠা অস্বাভাবিক না। কিন্তু টিকা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আকুল হল কারা? 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা', বিভিন্ন দেশের সরকার, এলিট সমাজ, বিশেষজ্ঞকুল, আর বাণিজ্যপ্রবর বিল গেটস! এদের প্ররোচনায় ভাইরাস নিয়ে তুমুল আতঙ্ক নির্মিত হল, এমন আতঙ্ক যার তুলনা স্মরণকালের ইতিহাসে নেই। তাই মনে হয়, যেভাবে আমাদের ভাইরাস-মগ্ন হয়ে থাকতে বলা হচ্ছে, বিষয়টা মোটেই অমন না; বরং ভাইরাস-এর বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ' ঘোষণার পিছনে অন্য কোনও ছক আছে। সেই ছক যদি সত্যি হয় তাহলে আমাদের বরং অন্য একটা যুদ্ধে নামতে হবে; আর সেই যুদ্ধে আমাদের বর্শামুখ হবে কর্পোরেটের আধিপত্য, অন্য কিছু না। আমাদের অস্ত্র হবে, কাণ্ডজ্ঞান আর জনবিজ্ঞতা। আমাদের মাটির কাছে ফিরে যেতেই হবে।)

পিঠে 'কোভিড' নিয়ে প্রায় এক বছর ধরে চলতে চলতে আমরা এখন ক্লান্ত, অবসন্নপ্রায়। সামনের দিনগুলো কেমন হবে ভাবতে ভাবতে এসে পৌঁছলাম এমন এক উদ্যানে যেখানে নানান্ নামের নানান্ গুণের 'টিকা' পাওয়া যায়, করোনার 'ভ্যাক্সিন'। শুনছি, ভ্যাক্সিন নিলেই আমাদের ক্লান্তি কেটে যাবে, পিঠের বোঝা সরে যাবে, মুক্তি মিলবে। আমরা সরল-বিশ্বাসী জনসাধারণ; তাই শোনা কথায় বিশ্বাস করতে মন চায়; তবে স্মৃতিচারণও আমাদের অভ্যেস। তাই মনে পড়ে, প্রায় এক বছর আগে আমরা তিনটে সত্যি কথা শুনেছিলাম :

১) 'নভেল করোনা' নামে এক ভাইরাস একটা অতিমারীর ('প্যানডেমিক') সৃষ্টি করেছে;

২) এটা শ্বাসতন্ত্রীয় ('রেসপিরেটরি') ভাইরাস, ফোঁটাণুর ('ড্রপলেট') মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে;

৩) তাতে যাঁরা বৃদ্ধ এবং নানান্ কারণে অসুস্থ তাঁদের বিপদ সবচেয়ে বেশি।

ভাইরাস সংক্রমণ নতুন না, মহামারী বা অতিমারীও নতুন কিছু না। সভ্য মানুষ হিসেবে আমাদের অন্তত দশ হাজার বছরের পথ চলার ইতিহাস আছে; তাই অভিজ্ঞতাও কম না। ডাক্তারি পাঠ্য বইগুলো সেইসব অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ করেছে। সেই মোতাবেক আরও তিনটে সত্যি কথা আমরা আগে থেকেই জানতাম। যেমন,

১) যেসব সংক্রমণ ফোঁটাণু দিয়ে ছড়ায় তাদের বেলায় আমাদের যা করণীয় তা হল:

(ক) ফোঁটাণু থেকে সাবধান থাকা (অপরের হাঁচি-কাশি বা নিবিড় সম্পর্ক এড়িয়ে চলা);

(খ) কেউ সংক্রমিত হলে তার যত্ন নেওয়া;

(গ) তীব্র সংক্রমণে কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তার চিকিৎসা করা; তার জন্য অনেক সময় হাসপাতালে ভর্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২) এই ধরনের সংক্রমণ ঠেকাতে কঠোর, অস্বাভাবিক পদক্ষেপগুলো তেমন কাজে লাগে না; বরং সেগুলো সেকেলে অথবা বস্তাপচা অথবা এমনকী, ক্ষতিকর।

৩) 'করোনা' নামে ভাইরাসটা অনেক পুরনো; 'ফ্লু'-এর মতো সেও আমাদের বহু প্রাচীন সহযাত্রী। তারা অন্যান্য ভাইরাস-এর মতোই পরজীবী; কিন্তু তাদেরকে বলা হয় 'সফল' পরজীবী, কেননা তারা সচরাচর আমাদের মেরে ফেলতে চায় না, আর আমরা বেঁচে থাকলে তারাও বেঁচে থাকতে পারে। আমাদের শরীরে যে-প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকে তাকে ফাঁকি দিতে তারা বারবার নিজেদের রূপ আর স্বভাব পালটে ফেলে। একে বলে, 'মিউটেশন'। এই ক্ষমতা আছে বলে তারা 'কভু প্রশান্ত কভু অশান্ত, দারুণ স্বেচ্ছাচারী' হয়ে উঠতে পারে। এই ক্ষমতাই তাদের সাফল্যের চাবিকাঠি। তাতে কখনও আশ্রয়দাতা হিসেবে আমাদের মৃত্যুও ঘটতে পারে; কিন্তু সমগ্র জনমানুষকে হিসেবের মধ্যে ধরলে মৃত্যুকে ব্যতিক্রম বলেই মনে হবে। তারা থাকে পশুপাখিদের জগতে; কিন্তু বারবার

আমাদের শরীরে এসে বাসা বাঁধতে চায়। তাই আমরা যেমন তাদেরকে এড়িয়ে যেতে শিখি, তেমনি তারাও বারবার শেখে, কীভাবে আমাদের বোকা বানাতে হবে।

✱✱✱✱

পুরনো এই তিনটে সত্যি কথা জেনে আর নতুন তিনটে সত্যি কথা শুনে আমরা অতিমারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলাম। 'যুদ্ধ' শব্দটা আমাদের দেশে মোটেই জনপ্রিয় না, তবে ইউরোপ বা আমেরিকার শাসকদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। যেকোনও প্রশ্নে তারা যুদ্ধের কথা বলে; অন্য কোনওভাবে যে প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় একথা তারা বুঝতেই চায় না। কিন্তু কী করা, যেকোনও সংকটে আমরা ইউরোপ-আমেরিকার দিকেই তাকিয়ে থাকি; তাই অদৃশ্য, অধরা ভাইরাস-এর বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ' অবান্তর হলেও আমরা যুদ্ধেই নামলাম। অথচ নেমেই আরও তিনটে বিভ্রান্তির সামনে পড়ে গেলাম। যেমন, আমাদের বলা হল,

১) এটা একটা নতুন ভাইরাস, তাই এর নাম 'নভেল' করোনা;

২) করোনার সংক্রমণ একটা নতুন ধরনের ব্যাধি; তাই কঠোর নিয়মকানুন পালন করতেই হবে;

৩) এর বিরুদ্ধে আমাদের 'ইমিউনিটি' (প্রতিরোধ ক্ষমতা) নেই, তাই যতকাল কোনও নতুন টিকা পাওয়া যাবে না ততকাল সর্বনাশের খাড়া আমাদের মাথার উপর ঝুলতেই থাকবে।

আমরা এসব কথায় একটু বিভ্রান্তই হলাম, কেননা আমাদের জ্ঞানগম্যির সঙ্গে এইসব কথা ঠিক মিলল না। তাই এই বিষয়ে যাঁরা পণ্ডিত তাঁদের শরণ নিলাম। তাঁরা জানালেন যে, ওই কথাগুলোর সবকটাই অর্ধসত্য। শুনে আমরা মুশকিলে, কেননা অর্ধসত্য যে মিথার চেয়েও খারাপ। কতটা খারাপ তার বিচার করা যাক:

(১) 'নভেল' মানে নতুন ঠিকই, কিন্তু সে তো করোনা নামে ভাইরাসটারই 'মিউটেশন'। যেকোনও নবজাতক তার জন্মদাতা বা জন্মদাত্রীর চেয়ে একটু নতুনই হয়, তাই তাকে এক হিসেবে নভেলও বলা যায়; কিন্তু সে

তো নতুন প্রজাতি না, নতুন প্রজন্ম মাত্র। তার স্বভাব-চরিত্র, রূপ-গুণ হুবহু পুরনো করোনার মতো হবে না ঠিকই; কিন্তু তাই বলে সে তো অন্য ভাইরাস-এর মতো, যেমন 'ইবোলা' বা 'স্মল পক্স'-এর মতো আচরণ করবে না। তাই 'নভেল' কথাটার তেমন আলাদা কোনও গুরুত্ব নেই।

(২) 'নতুন ব্যাধি'ই বা কীভাবে বলা যায়? আমরা বরং তাকে 'ফ্লু'-এর সঙ্গেই তুলনা করব, কেননা তারা দুজনেই আমাদের বহুকালের সহযাত্রী, আর ফ্লু-এর সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। এরা দুজনেই শ্বাসতন্ত্রীয় ভাইরাস, তারা আমাদের সংক্রমণ করে, কিন্তু তাই বলে আমরা সবসময় ব্যাধিগ্রস্ত হই না। 'করোনা' একটা ভাইরাস আর 'কোভিড' হল একটা ব্যাধি; কিন্তু করোনার সংক্রমণ মানেই কোভিড ব্যাধি না। সংক্রমণ শাস্ত্র অনুসারে, ভাইরাস-এর সংক্রমণ আর সংক্রমণ-জনিত ব্যাধি, এক কথা না। কারণ, সংক্রমণ কখনও কষ্টকর উপসর্গ সৃষ্টি করে, আবার কখনও করে না, আবার কখনও শরীরের যন্ত্রাংশগুলোর ক্ষতি করে দেয়। তাই শুধু কিছু সাধারণ উপসর্গ থাকলেই তাকে ব্যাধি বলা হয় না। করোনা আর ফ্লু-এর তুলনা করতে গেলে দেখা যায়:

(ক) তাদের উপসর্গগুলো প্রায় একই, কিছু কম বা বেশি। তাদের সংক্রমণে আমাদের ভোগান্তির কালও প্রায় একই, এক থেকে তিন সপ্তাহ। করোনার উপসর্গ কারোর কারোর বেলায় যেমন অতি তীব্র হতে পারে, তেমনি ফ্লু সংক্রমণেও কখনও কখনও উপসর্গের তীব্রতা সাংঘাতিক হয়ে যায়;

(খ) দুটো ভাইরাস একইভাবে আমাদের সংক্রমিত করে, অর্থাৎ ফোঁটাণু দিয়ে;

(গ) দুটোর সংক্রমণ ক্ষমতা, মানে একজনের থেকে অপরজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতাও প্রায় একই। 'নভেল' করোনার বেলায় দেখা গেছে, প্রথম দিকে তার সংক্রমণ ক্ষমতা ফ্লু-এর চেয়ে একটু বেশিই ছিল; কিন্তু অল্পকাল পরে তা কমতে কমতে প্রায় ফ্লু-এর কাছাকাছি এসে গেছে;

(ঘ) দুটো ভাইরাসেরই প্রধান লক্ষ্য বৃদ্ধ মানুষজন। তফাৎ এই যে, ফ্লু-এর

লক্ষ্যে শিশুরাও পড়ে। আর একটা তফাৎ হল, করোনার প্রধান লক্ষ্য অসুস্থ বৃদ্ধ, আর ফ্লু-এর লক্ষ্য সুস্থ বা অসুস্থ যেকোনও বৃদ্ধই;

(ঙ) ব্যাধি মানে, 'প্যাথোলজি' ('প্যাথোজ' = দুঃখ!), অর্থাৎ শরীরের ভিতরে নানান্ যন্ত্রাংশের ক্ষতি, তাদের কর্মক্ষমতার বিকার। করোনা এবং ফ্লু সাধারণত শ্বাসতন্ত্রকেই বিপদে ফেলে; কিন্তু অন্যান্য তন্ত্রও বিপদে পড়তে পারে, যেমন স্নায়ুতন্ত্র, পুষ্টিতন্ত্র এবং হৃদয়। এমনকী, তারা আমাদের শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকেও বিকল, বেচাল করে দিতে পারে। তখন প্রতিরোধ ব্যবস্থা আমাদের বন্ধু হওয়ার বদলে শত্রু হয়ে যায়;

(চ) কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, মৃত্যুর আশংকা কীসে বেশি? হিসেব করে দেখা যায়, সংক্রমণ হলে মৃত্যুর আশঙ্কা দুটোতেই প্রায় সমান। করোনার বেলায় অসুস্থ বৃদ্ধদের মৃত্যুরা আশঙ্কা অন্যদের চেয়ে বেশি ঠিকই, কিন্তু ফ্লু-ও এ-ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' ('হু') আমাদের জানিয়েছিল, করোনা সংক্রমণে নাকি আমাদের মৃত্যুর আশংকা ৩ থেকে ৪ শতাংশ। অথচ আমরা জানি যে, তীব্র ফ্লুতে মৃত্যুর আশংকা ১ থেকে ৮ শতাংশও হয়ে যেতে পারে। তাই অনেকে বলেন, করোনাকে এক ধরনের তীব্র ফ্লু ('ব্যাড ফ্লু') হিসেবে বিচার করাই ঠিক। এটা কোনও 'নতুন' ব্যাধি না।

(৩) এবার 'ইমিউনিটি'র কথা বা প্রতিরোধ ক্ষমতা। আমাদের বলা হল, করোনার বিরুদ্ধে নাকি আমাদের ইমিউনিটি নেই। 'ইমিউনিটি' শব্দটা গত কয়েক মাসে এতবার এতরকমভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে, এখন এটা একটা মুখরোচক শব্দ হয়ে গেছে। অথচ ইমিউনিটি শাস্ত্রটা অতি জটিল। বিবর্তনের নিয়মে আমাদের শরীরে প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি হয়; কিন্তু তার মানে এই না যে, আমাদের শরীরের কোনও একটা বিশেষ জায়গায় কোনও 'প্রতিরোধ বাহিনি' লুকিয়ে থাকে, আর দরকার মতো শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইমিউনিটি মানে, কিছু বিশেষ ধরনের অণু; তারা শরীরের সর্বত্রই ছড়িয়ে থাকে। সেই অণুগুলো যেমন আমাদের রক্তে থাকে তেমনি আমাদের ঘাম আর চোখের জলেও থাকে। তারা

নানান্ কাজের কাজি; প্রতিরোধ তার মধ্যে একটা মাত্র। তার মানে, ইমিউনিটি একটা সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা।

এই প্রতিরোধ ব্যবস্থার দুটো হাত; প্রথম হাতটার নাম, 'অ্যান্টিবডি'। এই অণুগুলো ভাইরাসকে প্রথমেই বেঁধে ফেলে, অকেজো করে দিতে চেষ্টা করে। অন্য হাতটার নাম, 'টি লিম্ফোসাইট'। 'লিম্ফোসাইট' নামে কিছু কোষ আছে, 'টি লিম্ফোসাইট' তারই একটা ধরন। ভাইরাসের বিরুদ্ধে ইমিউনিটির ব্যাপারে এই 'টি লিম্ফোসাইট'-এর গুরুত্ব 'অ্যান্টিবডি'র চেয়েও বেশি। কারণ, ভাইরাস যখন দলে ভারি থাকে তখন আমাদের অ্যান্টিবডি তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না; তখন ভাইরাস আমাদের কোষে ঢুকে গিয়ে তাকে বিষাক্ত করে দেয়। 'টি লিম্ফোসাইট' ছাড়া তখন আমাদের গতি নেই, তারাই আমাদের রক্ষাকর্তা। তারা তখন ওই বিষাক্ত কোষগুলোকেই ধ্বংস করে দেয়। তাতে ভাইরাস-এর কারখানাটাই নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ইদানিং ইমিউনিটি নিয়ে কথা উঠলেই সকলে 'অ্যান্টিবডি'র কথা বলেন। করোনার বিরুদ্ধে যে অ্যান্টিবডিগুলো দুর্বল সেকথা তো আমাদের জানাই; কিন্তু প্রতিরোধ ব্যবস্থার অন্য হাতটা যে মোটেই দুর্বল না, সেকথাও তো আমাদের জানা।

শুধু তাই না; করোনা আমাদের বহুকালের প্রতিবেশী বলে তার বিরুদ্ধে আমাদের 'ক্রস ইমিউনিটি'ও থাকে। অর্থাৎ তাদের মিউটেশন হলেও আমাদের শরীর তাদেরকে মোটামুটি চিনে ফেলতে পারে। সেই চেনার কাজটা 'অ্যান্টিবডি' করে না, করে 'টি লিম্ফোসাইট', কেননা তাদের স্মৃতিশক্তি অতি প্রখর। একই ভাইরাস যে-রূপেই নতুন করে আসুক না কেন, তাকে কীভাবে চিনে ফেলতে হবে সেই উপায়টা 'টি লিম্ফোসাইট'-এর জানা। এই কারণেই তাদের এত গুরুত্ব। তাই প্রায় সতেরো বছর আগে 'সার্স-১' নামে একটা ব্যাধির অতিমারী হয়েছিল; তার টিকা নেই, কিন্তু তার বিরুদ্ধে ইমিউনিটি আজও সজাগ আছে।

তাছাড়া, শ্বাসতন্ত্রীয় ভাইরাসের বিজ্ঞান অনুসারে জনমানুষের মধ্যে ভাইরাসের বিরুদ্ধে একটা জন-প্রতিরোধ ব্যবস্থাও ক্রমশ তৈরি হয়, তাকে বলা হয় 'হার্ড ইমিউনিটি'। অবশ্য তা তৈরি হতে সময় লাগে। অথচ আমরা শুনলাম, করোনার বিরুদ্ধে নাকি ওরকম 'হার্ড ইমিউনিটি' হবে না। প্রথমত,

অমন কথা অবৈজ্ঞানিক আর দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানের এই পরিচিত সূত্রটা সম্প্রতি গবেষণাগারেও প্রমাণিত হয়েছে। তাহলে যাঁরা হয় না, হবে না বলে পরিত্রাহী চীৎকার জুড়লেন তাঁদের কেউ হয়তো না-বুঝেই অমন করলেন, আর বাকিদের নিশ্চয়ই কোনও স্বার্থ ছিল। স্বার্থটা কী?

আমরা বুঝলাম, একটা জনমত তৈরির চেষ্টা চলছে, যাতে সাত তাড়াতাড়ি টিকা আসে; টিকা নিয়েই নাকি কৃত্রিম 'হার্ড ইমিউনিটি' তৈরি করতে হবে। কিন্তু আমরা তো জানি, করোনার মতো ফ্লু-এর বেলাতেও আমাদের ইমিউনিটি দুর্বলই। তাতে কী? ফ্লু-এর সেই দুর্বল ইমিউনিটিকে সবল করে তুলবার জন্য টিকাও আছে; কিন্তু তা নিজেই এত দুর্বল যে এক বছরও টেকে না। অতএব, করোনার ইমিউনিটি নেই বলেই টিকা নিতে হবে, এই যুক্তিটা নিজেই অতি দুর্বল।

কিন্তু কী করা? আমাদেরকে এখন টিকার লাইনে প্রায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। নানান্ কোম্পানির নানান্ টিকা; কোনটা কতটা ভাল তা নিয়ে সোচ্চার প্রতিযোগিতাও চলছে। তা চলুক; আমরা বরং এই অবসরে ভেবে নিই, টিকা কখন দরকার, কখন না।

✷✷✷✷

ভাইরাস সমেত অসংখ্য জীবাণু পরিবৃত হয়ে আমাদের বসবাস, অনন্তকাল ধরে। ভাইরাসের সংখ্যা অগণন। তাই আমরা যদি ভাবি, যেকোনও ভাইরাস আমাদের মনুষ্যসমাজে এলেই তার বিরুদ্ধে একটা টিকা তৈরি করব তাহলে সেটা আমাদের বাসনাবিলাস ছাড়া কিছুই না। তবে কখনও কখনও টিকার দরকার হয়, সেকথা ঠিক। কখন দরকার হয়? দরকারের তিনটি কারণ :

১) ভাইরাসের আচরণ,
২) ভাইরাসের গুণ,
৩) ওষুধ কোম্পানি।

ভাইরাসের আচরণ। যেমন,

যখন কোনও ভাইরাসের সংক্রমণ ক্ষমতা খুব বেশি হয়, তার ফলে আমাদের শারীরিক ক্ষতি হয়ে যায়, আর যখন তার মারণ ক্ষমতা অতি তীব্র হয়।

আমরা রেবিস, স্মল পক্স, হাম, পোলিও ইত্যাদির টিকা নিয়েছি। কারণ, হামের সংক্রমণ ক্ষমতা করোনা ভাইরাসের তুলনায় ৫ থেকে ৮ গুণ বেশি। রেবিস (জলাতঙ্ক) রোগে সময়মতো চিকিৎসা শুরু না-হলে মৃত্যুর আশংকা প্রায় ১০০ শতাংশ। স্মল পক্স যে কী ভয়ংকর রোগ আমরা জানি। পোলিওতে শারীরিক ক্ষতির (প্যারালিসিস) কথাও আমাদের জানা। ইবোলার বিরুদ্ধেও টিকার দরকার ছিল, কেননা ইবোলাতেও মৃত্যুহার প্রায় ৬০ থেকে ৯০ শতাংশ। টিটেনাস এবং টিবি-র মতো জীবাণুর বেলাতেও টিকার দরকার ছিল; তাই টিকা বানানোটা যথাযথ ছিল।

ভাইরাসের গুণ। তার মানে,

যেসব ভাইরাস ঘন ঘন মিউটেশন করে না, অর্থাৎ স্বাভাবের দিক থেকে মোটামুটি স্থিতিশীল তাদের জন্য টিকা প্রযোজ্য। যেসব ভাইরাসের মধ্যে বারবার মিউটেশন করার মতো গুণ আছে তাদের বিরুদ্ধে টিকা বানালেও তার কাজ দীর্ঘস্থায়ী হতে চায় না।

ওষুধ কোম্পানি। এটাই টিকা বানানোর পিছনে আজকের দিনে সবচেয়ে বড় শর্ত।

ওষুধ শিল্প যদি মনে করে, টিকা বানাবে, তাহলে নাকি আমাদের বুঝতে হবে টিকার দরকার আছে! ওষুধ শিল্প কখন মনে করবে? যখন সে বুঝবে যে, টিকা বানালে তার যথেষ্ট মুনাফা আসবে। মুনাফার সম্ভাবনা কম থাকলে, যত যুক্তিগ্রাহ্য কারণই থাক, টিকা বানানো হবে না। এই কাণ্ড ঘটেছিল, ইবোলা সংক্রমণের বেলায়। এই সংক্রমণ ঘটেছিল পশ্চিম আফ্রিকায়। সারা পৃথিবীর মানবদরদী মানুষজন টিকার প্রস্তাব রেখেছিলেন, দাবিও; বানানোও সম্ভব ছিল। বানানোর কাজ অনেক আগে, ১৯৯০ সালেই শুরু হয়েছিল; কিন্তু ওষুধ কোম্পানিগুলো বেশ কিছুকাল টালবাহানা চালিয়েছিল, কেননা তাতে মুনাফার পরিমাণ ছিল খুব অল্প। শেষ পর্যন্ত ২০১৪ সালে তা বাজারে আসে। তাই অনেকে টিকার সঙ্গে অর্থনীতির যোগ দেখিয়ে বলেছিলেন, এ হল 'ইবোলোনোমিক্স'!

এ তো গেল দরকারের কথা। তাহলে ভাবতে হবে, কোভিড-এর টিকা কি সত্যিই দরকার? অন্তত নতুন কোনও টিকা না এলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে

যাবে, এমন তো মনে হয় না। তবুও তর্ক সরিয়ে রেখে টিকা বানানোই যায়; কিন্তু দেখতে হবে, তার কার্যকারিতা কেমন। যে-টিকা কার্যকরী না তার জন্য খরচ করতে যাব কেন?

কার্যকারিতা যাচাই করতে হলে তিনটে মানদণ্ড আছে; দেখতে হবে,

(ক) করোনা সংক্রমণে মৃত্যুর হার কত,

(খ) এই সংক্রমণ থেকে সেরে ওঠার হার কত, আর

(গ) সমগ্র জনসমষ্টির মধ্যে এই সংক্রমণের হার কত?

প্রথম আর তৃতীয়টা যদি বেশি হয়, আর দ্বিতীয়টা যদি কম হয় তাহলে কার্যকারিতা প্রমাণ করা যায়, বা বলা যায় যে, টিকা কার্যকরী হওয়ার যুক্তি আছে।

তো প্রথমে মৃত্যুহার দেখা যাক।

পরিসংখ্যান দেখিয়ে দিল, করোনা সংক্রমণে মৃত্যুহার খুবই কম। অসুস্থ বৃদ্ধদের মধ্যে অবশ্য মৃত্যুহার যে বেশি তা সকলেই জানে; কিন্তু যাঁদের বয়েস ৭০ বছরের কম তাঁদের মধ্যে মৃত্যুহার ১০ হাজার জনের মধ্যে মাত্র ৫। আর সমগ্র জনসমষ্টিতে করোনা সংক্রমণে মৃত্যুর হার ০ থেকে ০.৫৭ শতাংশ। দেখা গেছে, এক-একটা দেশে এক-একরকম; কিন্তু কোথাও আর্তনাদ করার মতো তেমন বেশি না। কেউ কেউ ৪৫-টি দেশের হিসেব নিয়ে একই কথা বলেছেন। আমরা জানি, পরিসংখ্যান নিয়ে মারপ্যাঁচ করা যায়, অন্যান্য রোগের সঙ্গে করোনাকে মিলিয়ে মিশিয়ে আর্তনাদ তোলা যায়। কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ, নমস্য পরিসংখ্যানবিদরা মারপ্যাঁচ খুলে বিষয়টা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তার মানে, প্রথম মানদণ্ডটা মিলল না।

এবার দেখা যাক, সেরে ওঠার হার।

শোনা যায়, কোনও কোনও দেশে করোনা সংক্রমণ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার হার প্রায় ৯৯.৮ শতাংশ। আমাদের দেশের ছবিটাও খারাপ কিছু না; সংক্রমণ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার হার দ্রুত বাড়তে বাড়তে এই মুহূর্তে প্রায় ৯৮ শতাংশ। আর কিছুকালের মধ্যে তা আরও বাড়বে একথা বলাই যায়; আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গেই তা মিলিয়ে নিতে পারি। রোগভোগ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার পিছনে আমাদের দেশের ডাক্তারদের কৃতিত্ব থাকতে পারে, অথবা এমনও

হতে পারে যে, আমাদের দেশে করোনা সংক্রমণ তেমন তীব্র না। তাছাড়া, যাঁরা করোনার অভিঘাতে মারা যাচ্ছেন তাঁদের প্রায় সকলেই বৃদ্ধ এবং অন্যান্য রোগে কাতর। শুধু করোনা কেন, যেকোনও ভাইরাসের সংক্রমণই তাঁদের পক্ষে মারাত্মক। ওদিকে টিকা যাঁরা বানাচ্ছেন তাঁরা বলছেন, টিকার কার্যকারিতা নাকি ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ। টিকা না-নিয়েই যদি ব্যতিক্রমী কিছু মানুষজন ছাড়া বাকি সকলে সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন তাহলে টিকার অর্থ কী? আর এমন তো না যে, টিকা নিলে আর সংক্রমণ হবে না। টিকা নিলেও সংক্রমণ হতে পারে, যিনি টিকা নিয়েছেন তিনি সংক্রমণ ছড়াতেও পারেন। তবে টিকা নিলে তীব্র সংক্রমণ হবে না, সেকথা সত্যি। এইটুকুই।

আর সমগ্র জনসমষ্টিতে করোনা সংক্রমণের হার মাত্র ৬.৪ শতাংশ।

এই হিসেবগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে, করোনার বেলায় টিকার কার্যকারিতার বিচারটা করাই যাচ্ছে না। কারণ, এখানে প্রথম আর তৃতীয় মানদণ্ডটাই কম, বরং দ্বিতীয়টাই বেশি। অতএব, করোনার টিকার কার্যকারিতা বোঝা অসম্ভব।

কার্যকারিতার পরে আসে নিরাপত্তার কথা। টিকা, সে যেমনই হোক, তা সংক্রামক ভাইরাসের টুকরো থেকেই অথবা তার 'জিন' থেকে তৈরি হয়; তাই তাতে শরীরে অল্প সময়ের জন্য সামান্য কিছু উপসর্গ তৈরি হতেই পারে। সেকথা নতুন না। কিন্তু তীব্র, মারাত্মক উপসর্গ হচ্ছে কিনা বা ভবিষ্যতে অমন কিছু হবে কিনা তা নিয়ে পরীক্ষা চালাতে হয়। তার মানে, টিকাটা যে নিরাপদ তা প্রমাণ করতে হবে। কীভাবে প্রমাণ হবে?

ভাইরাস এবং জীবাণুর বিরুদ্ধে টিকা বানানোর পদ্ধতি আছে। পুরনো পদ্ধতিটাকে বলা যায়, প্রথাগত। ওই পদ্ধতিতে বানানো টিকা মোটামুটি নিরাপদ, সেকথা বহু বছরের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত। কিন্তু এই পদ্ধতি অনেক সময়সাপেক্ষ। এদিকে আমাদের তো তাড়াহুড়ো আছে, এক্ষুনি টিকা চাই। এমন তাড়াহুড়ো যে, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করে দিলেন, স্বাধীনতা দিবসেই টিকা হাতে এসে যাবে। তাই প্রথাগত পদ্ধতির বদলে বলা হল, 'জিনেটিক এঞ্জিনীয়ারিং' ব্যবহার করতে হবে; তাতে খরচ অনেক বেশি হলেও সময় লাগবে অনেক কম। কম মানেও অনেক বিজ্ঞানীই জানালেন, অন্তত কয়েক বছর; কিন্তু করোনার বেলায় দেখা গেল, ১ বছরও লাগল না।

ভাল কথা; হয়তো বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির উন্নতিই এর কারণ। কিন্তু কথা হল, 'জিনেটিক এঞ্জিনীয়ারিং'-এর ফল কেমন হবে, তা কি আমাদের জানা আছে? বীজ আর খাদ্যের উপর এই পদ্ধতি খাটিয়ে কী কুফল ঘটে গেছে তা নিয়ে সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা আমাদের জানিয়েছেন। যেমন, একটা ভয়ংকর বিপদ হল, 'অটো ইমিউন ডিজিজ'। এই রোগগুলোতে শরীরের ইমিউন ব্যবস্থাগুলো বেচাল হয়ে যায়; তাকে আর সামলানো যায় না। তাই নতুন পদ্ধতিতে টিকা বানিয়ে আমরা জনমানুষকে ওরকম বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছি কিনা তা তো দেখতে হবে। দেখতে গেলে বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে, নিরাপত্তার পরীক্ষা চালাতে হবে। অতটা সময় কি আমরা দিচ্ছি?

নিরাপত্তার পরীক্ষাগুলো যথযথ না-হলে যে চূড়ান্ত দুর্যোগ নেমে আসতে পারে সেকথা তো সত্যি; তার প্রমাণও আছে। এইভাবে ডেঙ্গুর টিকা দিতে গিয়ে ফিলিপিন্স-এ আর পোলিওর টিকা দিতে গিয়ে আফ্রিকায় যে দুর্যোগ ঘটেছিল, বেশ কিছু প্রাণহানিও ঘটেছিল তা তো আমাদের জানা। আর টিকার নিরাপত্তা নিয়ে পরীক্ষা চালাতে গেলে যাঁদের উপর পরীক্ষা হচ্ছে তাঁদেরকে ভবিষ্যৎ বিপদের কথা আগে থেকে জানানোর নিয়ম তো শাস্ত্রেই আছে। সেই নিয়ম কি তাড়াহুড়োর মাথায় মনে থাকবে বা পালন করা হবে?

এইসব প্রশ্ন উঠবেই। কারণ, বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলোর সততা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আমাদের গভীর সংশয় আছে; তাই নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় থাকেই। তাছাড়া নানান্ রোগে অসুস্থ বৃদ্ধদেরকে তো টিকা দেওয়া যাবে কিনা তা নিয়েও সংশয় কাটেনি, অথচ করোনায় বিপদ তো তাঁদেরই বেশি। তাহলে?

অতএব, তড়িঘড়ি টিকার নিরাপত্তা যাচাই করাটা অসম্ভবই।

তার মানে, করোনার টিকা আদৌ দরকার কিনা, টিকা বানালেও তা কার্যকরী হবে কিনা এবং সেই টিকা কতটা নিরাপদ হবে, এইসব প্রশ্নের মীমাংসা হচ্ছে না। মীমাংসা সম্ভব কিনা কেউ জানে না। অথচ তাড়াহুড়ো বজায় থাকছে। তাই প্রশ্ন জাগে, কোনও 'অন্যায় শৌখিনতায়' কি আমাদের মন হারিয়ে যাচ্ছে? কেন আমরা টিকা নিয়ে, একটা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে এত আকুল হলাম?

আকুলতার কারণ, আমাদের আতঙ্ক; মৃত্যু নিয়েই আমাদের উৎকণ্ঠা। মানুষ হিসেবে সেটা অস্বাভাবিক না। কিন্তু টিকা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আকুল হল কারা? প্রথমে আকুল হল 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'; সেই আকুলতা সে ছড়িয়ে দিল সরকারের মনে। সরকার তার আকুলতা ছড়িয়ে দিল এলিট সমাজের মধ্যে; তাতে 'শিক্ষিত' মানুষজন আছেন, নানান্ বিষয়ে পারদর্শীরাও আছেন। এদের সকলের মাথার উপরে আছে বাণিজ্যপ্রবর বিল গেটস। তারই প্ররোচনায় অন্য সকলে মিলে একটা ভাইরাস নিয়ে তুমুল আতঙ্ক নির্মাণ করল; এমন আতঙ্ক যার তুলনা স্মরণকালের ইতিহাসে নেই। সেই নবনির্মিত আতঙ্ক তারা ছড়িয়ে দিতে চাইল জনমানুষের মধ্যে। কিন্তু মুশকিল হল, ইতিমধ্যে ভাইরাস এবং বিশেষ করে করোনা ভাইরাস নিয়ে তথ্যের জলপ্রপাত ঘটে গেছে।

তাকে অনেকে বলেছেন, 'শতাব্দীর সেরা তথ্য বিপত্তি'। কারণ দেখা যাচ্ছে, তথ্যের দাপটে দিন হয়ে যাচ্ছে রাত, আর রাত হয়ে গেল দিন। মানুষজন তাঁদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে অনেক তথ্যই মেলাতে পারছেন না, তাই হতভম্বপ্রায়। তবে আজকের দুনিয়ায় বিজ্ঞানী বলুন, ডাক্তার বলুন বা পরিসংখ্যানবিদ, তাঁদের অনেকের মধ্যে এই নিদারুণ দুঃসময়েও মননশীলতা, দরদ, সততা আর বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বস্ততা টিকে আছে। তাঁরাই তথ্য পরীক্ষা করে জানালেন:

(ক) চিনের হুবেই প্রদেশ যেখান থেকে অতিমারীর সৃষ্টি, সেখানে কোভিড সংক্রমণে আক্রান্তের হার ছিল ১ হাজারে মাত্র ১ জন, আর মৃত্যুহার ছিল ২০ হাজারে ১ জন।

(খ) ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি যে-হিসেব বেরিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশে মৃত্যুহার ১০ লক্ষে ১০৪ জন, আর পশ্চিমবাংলায় ১০ লক্ষে ৯১ জন। করোনাবিহীন, স্বাভাবিক সময়ে আমাদের দেশে মৃত্যুহার ১০ লক্ষে ৭২০০ আর পশ্চিমবঙ্গে ৫৯০০। এবার যদি একটা অনুপাত হিসেব করা যায় তাহলে দেখা যাবে, ভারতের বেলায় তা ১.৪ এবং পশ্চিমবাংলায় ১.৫ শতাংশ। তার মানে, গাড়ি দুর্ঘটনা থেকে ক্যানসার

পর্যন্ত নানান্ কারণে সারা ভারতে যদি ১০০ জনের মৃত্যু হয় তাহলে তার মধ্যে কোভিড-এর ভাগে পড়ে মাত্র ১.৪ জন (পশ্চিমবাংলার বেলায় ১.৫ জন)।

(গ) তবে ওই ১.৪ বা ১.৫-এর হিসেবটাও কতটা নির্ভরযোগ্য তা বলা কঠিন। কারণ, করোনা ছাড়া আরও অন্তত ১৬-টা ভাইরাস গত কয়েক বছর ধরে আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অনেকেই আমাদের শরীরে বাসা বাঁধছে। তাদের অনেকেই শ্বাসতন্ত্রীয় ভাইরাস। আমরা কারণে-অকারণে কোভিড-এর পরীক্ষা চালাচ্ছি ('আর টি পি সি আর'); অন্য ভাইরাসের পরীক্ষা বাদ। তাহলে কীভাবে সত্যিই সাব্যস্ত হচ্ছে যে, কোভিডই মৃত্যুর নির্দিষ্ট কারণ? যদি উপসর্গ আর রোগের চিহ্ন ('সাইন') দেখেই কোভিড বলে মনে হয়, সেই একই উপসর্গ আর চিহ্ন তো অন্যান্য শ্বাসতন্ত্রীয় ভাইরাসেও থাকে। তাহলে?

(ঘ) নানান্ ধরনের শ্বাসতন্ত্রীয় ভাইরাসে এমনিতেই সারা দুনিয়ায় বছরে ২৬ লক্ষ মানুষ মারা যান। 'হু'-এর হিসেব অনুসারে, শুধু ফ্লু-তেই মৃত্যুর সংখ্যা ৩ থেকে ৬.৫ লক্ষ।

(ঙ) কোভিড-এ মৃত্যু নিয়ে আমাদের উৎকণ্ঠার মধ্যে সততা কতটুকু? কারণ, ম্যালেরিয়া, এইডস আর টিবি, শুধু এই তিনিটে ব্যাধিতেই দুনিয়া জুড়ে মৃত্যুর সংখ্যা অন্তত ১ কোটি। তাতে তো আমাদের বিদ্বজ্জনেরা এত আকুল হন না।

(চ) অন্তত ২০ কোটি ভারতবাসী রোজ খালি পেটে ঘুমোতে যান। তাঁরা মারা যান না? নাকি, সরকারি হিসেব মতো আমাদের দেশে অনাহারে এখন আর কেউ মারা যায় না, একথা শুনে আমরা ডুগডুগি বাজাবো?

(ছ) শোনা যায়, ইংল্যান্ডে নাকি কোভিড-এর টিকা নিয়ে হুড়োহুড়ি পড়েছে। অথচ হিসেব বলছে, শ্বাসতন্ত্রীয় সংক্রমণে সেখানে মৃত্যুর সংখ্যা অন্যান্য বছরের তুলনায় এ-বছরে কিছু বাড়েনি! তার উপর, সেখানে নাকি এখন করোনা নতুন রূপ ধরে ('স্ট্রেইন') করোনা এসেছে; তাহলে যাঁরা টিকা নিয়ে স্বস্তি পেলেন বলে ভেবেছিলেন, তাঁদের এবার কী হবে? অবশ্য অনেকে জানিয়েছেন, ভয় নেই ওই টিকাতেই চলবে! তাহলে আর 'মিউটেশন' মিউটেশন' বলে এতকাল হট্টগোল তোলা হল কেন?

(জ) প্রখ্যাত, জনপ্রিয় ডাক্তারি পত্রিকা, ল্যান্সেট-এর সম্পাদকীয়তে কিছুকাল আগে বলা হয়েছিল, করোনার 'প্যানডেমিক' চলছে না, চলছে 'সিন্ডেমিক'! ঠিকই। তার মানে, অতিমারীর অজুহাতে অন্য অসুখবিসুখগুলোকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। যেসব মানুষজন, বিশেষ করে বয়স্করা ডায়াবিটিস, হার্টের রোগ, ক্যানসার, স্নায়ুতন্ত্রের রোগ, শ্বাসতন্ত্রের রোগ, ইত্যাদিতে বেশ কিছুকাল ধরে ভুগছেন তাঁরা চিকিৎসক বা হাসপাতালের দ্বারস্থ হতে পারছেন না। হয় চিকিৎসক সাড়া দিচ্ছেন না, নয়তো হাসপাতালে যাওয়াই যাচ্ছে না। তো এই অবস্থায় ওই রোগগুলো তো নিশ্চুপ থাকবে না। এই রোগীদের বেশির ভাগই বয়স্ক। তাহলে একটা তথাকথিত ব্যাধি ঠেকাতে গিয়ে অন্য, চেনা ব্যাধিগুলোকে, বয়স্ক মানুষজনকে যে ব্রাত্য করে রাখা হল, এটা কি নিষ্ঠুরতা না?

(ঝ) কোনওভাবে, প্রাণান্তকর চেষ্টায় এইসব রোগীরা হাসপাতালে ভর্তি হলেও শান্তি নেই, কেননা কোভিড পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। এর পর তাঁদের মধ্যে কেউ মারা গেলে পিঠে কোভিড-এর ছাপ পড়েছে কিনা দেখা হবে। ছাপ থাকলে সেটাই নাকি মৃত্যুর কারণ! এমনিতেই ডাক্তারি শাস্ত্রে 'মৃত্যুর কারণ' নিয়ে অনেক বিতর্ক, কেউই সংশয়মুক্ত না; কোনটা মৃত্যুর নির্দিষ্ট কারণ আর কোনটা মৃত্যুর সাক্ষী, তা বলা স্বাভাবিক নিয়মে এখনও পর্যন্ত অসম্ভব। মৃত্যুর ঠিক আগে যাকে দেখা গেছে তাকেই যদি 'কারণ' বলে সাব্যস্ত করতে হয় তাহলে একটা 'ফ্যালাসি'তে উপনীত হতে হয়, তাকে বলে 'পোস্ট হক আর্গো প্রপ্টার হক'! তার মানে, ঠিক আগের মুহূর্তে যাকে দেখা গেছে সেটাই যদি 'কারণ' হয় তাহলে রাত্রির কারণ দিন আর দিনের কারণ রাত্রি! তাই কোভিড-এ মৃত্যুর মানে আমাদের অজানা।

(ঞ) 'ছয় ফুট'-এর 'নিরাপদ' দূরত্ব বজায় না-রাখলে আমরা সবাই করোনার ধাক্কায় কাত হয়ে যাব, এই তত্ত্ব আমাদের দেশের কোথাও তো মিলল না। না-মিলল বন্যাবিধ্বস্ত এলাকাগুলোতে, না-মিলল ঘনবসতি পূর্ণ অঞ্চলগুলোতে, না-মিলল এমনকী, এশিয়ার বৃহত্তম বস্তি, ধারাভিতে। এমন তথ্য কোথাও নেই যে, এইসব অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায়

সংক্রমণের হার বা মৃত্যুর হার বেশি। মাত্র কিছুদিন আগে বিহারে বড় বড় নির্বাচনী সভা হয়ে গেছে, 'কোভিড'-এর হাহাকার তো শোনা গেল না। দলে দলে দিনমজুর একসঙ্গে হাজার হাজার মাইল পথ পরিক্রমা করেছেন, 'কোভিড'-এর কামড়ে আর্তনাদ করেননি। এই মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ মানুষ দিল্লির উপকণ্ঠে জড়ো হয়ে আছেন, 'কোভিড' কোথায়?

তো তথ্যের জলপ্রপাতে এমন অনেক সত্যিই উদ্ভাসিত হয়েছে। তার সামান্যই উল্লেখ করা হল। অবশ্য জলপ্রপাত ঠেকানোর চেষ্টাও দ্রুত গতিতে চলছে। সামাজিক সংবাদ মাধ্যমগুলোকে কব্জা করার কাজ চলছে পুরোদমে। শাসকের কাছে যে-সংবাদ অস্বস্তিকর তাকে ছড়াতে দেওয়া যাবে না! তাহলে সংবাদ মাধ্যম স্বাধীন একথাও আর বলা যাবে না।

✷✷✷✷

এখন আমরা ঠিক এইখানে দাঁড়িয়ে আছি। এখান থেকে আমরা যদি একটু ঘুরে তাকাই তাহলে একটা একটা অদ্ভুত ছবি দেখতে পাব; তার সঙ্গে আজকের ছবিটার মিল বড় কৌতূহলের। ছবিটা ২০০৯ সালের। তখন হয়েছিল আর এক মহামারী, 'সোয়াইন ফ্লু'। তার দাপট ছিল আফ্রিকা আর দক্ষিণ এশিয়ায়, ইউরোপে কম। কিন্তু তাতে কী? 'সাদা' শাসকরা তো অল্প দুঃখেই কাতর হয়ে পড়েন; তাই ইংল্যান্ডের পণ্ডিতরা জানিয়ে দিলেন, 'সোয়াইন ফ্লু'-এর সংক্রমণে সেখানে নাকি ৬৫ হাজার মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। তাই এক্ষুনি টিকা না-পেলে সমূহ সর্বনাশ। টিকা অবশ্য তখনও আসেনি; কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা গেল, মৃত্যুর সংখ্যা ৫ হাজারের বেশি হল না। অসীম পাণ্ডিত্যপূর্ণ হিসেবের এই হল মহিমা। একই কাণ্ড আজও চলছে।

২০০৯ সালের আগে 'হু'র মতে, অতিমারীর ৩-টা মানদণ্ড ছিল। যেমন,

১) সংক্রমণ হবে একটা নতুন ভাইরাসের কারণে;

২) সংক্রমণ দ্রুত বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে পড়বে;

৩) সংক্রমণ হবে তীব্র এবং তাতে মৃত্যুর সংখ্যা হবে ভয়ংকর।

তিনটে মানদণ্ডই বিজ্ঞানের বিচারে ঠিক। কিন্তু 'সোয়াইন ফ্লু'-এর বেলায় ওই তিন নম্বর মানদণ্ডটা মেলেনি। তাই বিজ্ঞানের বিচারে তার বিরুদ্ধে টিকার দরকার ছিল না। কিন্তু 'হু' এমন একটা সংস্থা যার উপর শুধু বিজ্ঞানের চাপ থাকে না, ওষুধ শিল্পের চাপও থাকে; আর সেই চাপটা বিজ্ঞানের চেয়েও বেশি। সেটা ইদানিং আরও স্পষ্ট হয়েছে। কারণ, ওষুধ শিল্পের টাকায় 'হু' পুষ্টি লাভ করে। সেই ওষুধ শিল্পের চাপ এত বেশি যে 'হু'-এর নির্দেশে তৃতীয় মানদণ্ডটাই পালটে গেল। বলা হল, সংক্রমণ তীব্র হতে হবে এমন না, তীব্র হতে পারে আবার হালকাও হতে পারে! এই কথার মানে যে কী তা কারোর বোধগম্য হল না; কিন্তু মানদণ্ড পালটে দেওয়ার ফলে নতুন টিকা তৈরির যুক্তি সাজানো গেল।

এর পর যখন সংক্রমণের দাপট কমে গেল তখনও সাহেবদের ভয় কাটে না; তারা বলল, কমে কিছু যায়নি, এ হল আসন্ন ঝড়ের পূর্ভাভাস, সামনে আসছে দ্বিতীয় ঢেউ ('সেকেন্ড ওয়েভ')। কী করে জানা গেল? না, গবেষণাগারের পরীক্ষায় নাকি জানা গেছে! কিন্তু গবেষণাগারের পরীক্ষার ফলাফল কি চলমান জনসমাজে সরাসরি প্রয়োগ করা যায়? তা যায় না, একথা যেকোনও বিজ্ঞানের ছাত্র জানেন। কিন্তু কী করা? জনমনে আতঙ্ক ছড়াতে গেলে এ ছাড়া উপায়ই বা কী?

তাই বিদ্যুৎ গতিতে টিকা তৈরি হল, নানান দেশে বিক্রিবাটাও হয়ে গেল। জার্মান সরকার টিকার প্রায় ৬ কোটি ডোজ কিনে ফেলল। ওষুধ শিল্পের কর্মকাণ্ড সার্থক।

এদিকে লোকে কিন্তু তেমন উৎসাহ দেখাল না। তাই কিছুকাল পরে জার্মান সরকার টিকার প্রায় ৫ কোটি ডোজ ট্রাকে ভর্তি করে বর্জ্য পদার্থের মধ্যে ফেলে দিয়ে নষ্ট করে দিল। এইবার কেউ কেউ প্রশ্ন তুললেন, এ আবার কী, টিকা তো কেনা হয়েছে লোকসাধারণের ট্যাক্স-এর টাকায়, সেই টাকা কি এইভাবে নয়ছয় করে দেওয়া উচিত? তাঁরা হয়তো এই কথাটা ভেবে দেখেননি যে, টাকা মানে পুঁজি। পুঁজির বিনাশ নেই, ওটা কখনও নষ্ট হয় না,

তার হাতবদল হয় মাত্র। তার মানে, পুঁজির শুধু 'পথ চাওয়াতেই' না, পথ চলাতেও 'আনন্দ'। এমন আনন্দ যে, ওই টিকা বানিয়ে আর বিক্রি করে ওষুধ শিল্পের মুনাফার পরিমাণ ছিল, প্রায় ১৮ বিলিয়ন ডলার। দশ বছর পরে, এখন অবশ্য ওষুধ শিল্প আর বিলিয়ন-এ হিসেব কষে না, হিসেব এখন ট্রিলিয়ন-এ।

দশ বছর আগেকার ছবিটা আজকের সঙ্গে কেমন মিলে যাচ্ছে সেটাই কৌতূহলের। তার মানে, এখন যা হচ্ছে তার রিহার্সাল হয়ে গেছে দশ বছর আগেই। নতুন মঞ্চসজ্জা তৈরি করতে দশ বছর লেগে গেছে। ইতিমধ্যে ২০১৮ সালে ইউরোপ আর আমেরিকায় ফ্লু-এর মহামারী হয়েছিল; তা ছিল 'সোয়াইন ফ্লু'-এর চেয়েও তীব্র। কিন্তু তখনও এত টিকার রব ওঠেনি। কেন? কারণ, নতুন চিত্রনাট্য তখনও হাতে ছিল না, হাতে এল ২০২০-এর শুরুতে। এই 'নতুন' ছবিটা যাতে চলে তার জন্য এখন জনসম্মতি তৈরি করতে হবে। শাসক কীভাবে জনসম্মতি নির্মাণ করে তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের যুগের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ নোয়াম চমস্কি আর এডওয়ার্ড হারমান। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত, তাঁদের লেখা 'ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট' বইটা অনেকের মনে পড়বে। তাই সঙ্গত কারণেই এখন প্রশ্ন উঠবে, হচ্ছেটা কী? আমরা তাহলে প্রায় এক বছর ধরে কী করলাম?

কী যে করলাম তা সত্যিই ভাববার কথা। বছরের প্রথম দিকে, 'হু' যখন অতিমারী ঘোষণা করছে, আমরা তখন তাকে উপেক্ষা করলাম, যেন 'সব ঝুট হ্যায়'। মাত্র ক'দিন পরে যখন দেখলাম, তৎকালীন মার্কিন সম্রাট ট্রাম্প নড়েচড়ে বসছেন তখন আমরাও উঠে দাঁড়ালাম। এর পর যা শুরু হল তাকে ছ্যাবলামি বলা যায়, তবে ভ্রান্তিবিলাসই বলা ভাল। আমরা ঘণ্টা বাজালাম, হুলুধ্বনি দিলাম, আলো নেভালাম, আলো জ্বালালাম... আরও কত কী! বললাম, এতেই করোনা ভাইরাস পালাবার পথ পাবে না। কিন্তু তাতে লাভ হল না, হওয়ার কথাও ছিল না। তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে, সরকার নির্বোধ? মান্যগণ্য সভাসদ পরিবৃত সরকার কি কখনও নির্বোধ হতে পারে? নামী জার্মান রাজনীতিবিদ হেলমুট শ্মিট অবশ্য বলতেন, সরকারের নির্বুদ্ধিতাকে কখনও ছোট করে দেখো না।

তাই ছোট করে দেখছি না, তবে এও দেখলাম যে, এর পর হঠাৎ যেন সরকার কোনও স্বপ্নাদেশ পেয়ে গেল, 'মাভৈঃ!' আমরা জানলাম, দেশটা আপাতত বন্ধ থাকবে, সব কাজ বন্ধ... সঙ্গরোধ (কুয়ারান্টাইন)... মুখোশ... লকডাউন, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের এই মাতালপনায় করোনার অবশ্য কিছুই যায় আসে না। সে চলল নিজের তালে, নিজের ছন্দে। এদিকে স্বপ্নাদেশ ছিল, চারদিকে আতঙ্ক ছড়াও, শুধু আতঙ্ক! সরকার ঠিক সেই কাজই করল। বলা হল, দিন কয়েকের মধ্যে এক লক্ষ লোক নাকি রাস্তায়-ঘাটে মরে পড়ে থাকবে, সৎকারের লোকও জুটবে না। তাই সেই এক লক্ষ লোকের মৃত্যুর 'আশঙ্কা' রোধ করতে সে কয়েক কোটি লোককে অনাহারে, অর্ধাহারে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল। কে তাকে অমন করতে বলল, স্বপ্নাদেশ কোত্থেকে এল? কর্পোরেট জগত থেকে? তা ছাড়া আর কী, কেননা সরকার যে কর্পোরেটের পোষ্য সেকথা তো স্পষ্টই হচ্ছিল ক্রমশ! কিন্তু সরকার কীভাবে আতঙ্ক ছড়ালো? পণ্ডিত, পারদর্শী, এলিট সমাজকে দিয়েই। তারাও কি তাহলে কর্পোরেটের পোষ্য? অনেকে তাই, সকলে নিশ্চয়ই না; কিন্তু যারা পোষ্য না তারা তো বিচারবুদ্ধি খাটালেন না!

এই যে আতঙ্ক বিদ্যায় সিদ্ধহস্তরা নিজেদের পারদর্শিতা দেখালেন তাতে আতঙ্কিত হল কারা? লোকসাধারণ? না, তাঁরা হননি। তাঁরা শুধু হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। কারণ, অন্নচিন্তা ভয়ংকরী, মৃত্যুচিন্তার চেয়েও। বিজ্ঞ, এলিট সমাজের বেলায় ঠিক উলটো। কিন্তু বিজ্ঞ সমাজের মধ্যে তো আমাদের সমাজসেবীরাও রয়েছেন; তাঁরা কী করলেন? আমাদের সমাজসেবীরা যে সৎ, পরহিতকাতর, বিদ্বান এবং সমাজ সচেতন তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। তাঁরা যে জনমানুষের কাছে যান, প্রান্তিক মানুষের সুখদুঃখের ভাগীদার হন সেকথাও সত্যি। কিন্তু মুশকিল এই যে, তাঁরা প্রান্তিক মানুষের কাছে চেতনা ছড়াতে যান, নিজেরা সচেতন হতে যান না। তাঁরা বলতে যান, শুনতে যান না; জানাতে যান, জানতে যান না। যদি যেতেন তাহলে আজকের ছবিটা অন্যরকম হতেও পারত। একশো বছর আগে যখন রাশিয়ার বুকে 'স্প্যানিশ ফ্লু'-এর ঝোড়ো

হাওয়া বইছে তখন সেখানে বিদ্বজ্জনের অভাব ছিল না; অথচ লেনিন বলেছিলেন, সোভিয়েতের কাছে যাও, ওই চাষি-মজুররাই বলে দেবেন, কী করা যায়। সেসব ইতিহাস আমরা পড়েছি, শুনেছি, কিন্তু এক বর্ণও বুঝিনি। তাই আমাদের ধারণা, লেখাপড়া না-করলে বোধবুদ্ধি গজায় না; "পড়তে হয় নইলে 'পিছিয়ে' পড়তে হয়"। সুতরাং আমরাই শিক্ষক, ওরা তো মূঢ়, মূক, ছাত্রমাত্র।

তাই আমাদের আকাশচুম্বী বিজ্ঞতার ফল অচিরেই ফলে গেল। কী সেই ফল? করোনা নিয়ে:

আমরা জনবিচ্ছিন্ন হতে শিখলাম;
প্রতিবেশী বা এমনকী, নিজের পরিবারকেও সন্দেহ করতে শিখলাম;
বাতিকগ্রস্ত হলাম;
ছুতমার্গ শিখলাম;
'স্বাস্থ্য পুলিশ' দিয়ে জনস্বাস্থ্য রক্ষা করতে শিখলাম;
আর সবচেয়ে বড় কথা, যে-অসাম্য সমাজে বিদ্যমান ছিল আমরা তা আরও বাড়িয়ে দিলাম। অসাম্য শুধু আর্থিক না, ন্যায় আর নিরাপত্তার অসাম্যও যে কী বীভৎস হতে পারে, এই ক'মাসের মধ্যে তা স্পষ্ট হয়ে গেল।

আমাদের কাণ্ডজ্ঞান কি তাহলে লোপ পেয়ে গেল, নাকি ওটা ছিলই না? জনবুদ্ধি অন্তত কিছুকালের জন্য জড়বুদ্ধি হয়ে গেল? একটা ভাইরাসের অভিঘাতে যুক্তিবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান বা ডাক্তারি বিজ্ঞান আর সমাজবিজ্ঞান যেন রসাতলে চলে গেল! এমনই হওয়ার কথা ছিল বোধহয়, কেননা বার্ট্রান্ড রাসেল বহুকাল আগেই বলে গেছেন, আধুনিক বিজ্ঞান একটা সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে দশটা নতুন সমস্যা তৈরি করে ফেলে! তাহলে তো বলতে হয়, এ এক 'পরমা যন্ত্রণা'!

আমাদের পারদর্শী, ভুয়োদর্শী পণ্ডিতরা অতিমারীর 'মডেল' বানালেন, অসংখ্য, বিচিত্র মডেল। ভাইরাস কবে, কোথায়, কেমন প্রাণঘাতি আচরণ করবে তার ছবি এঁকে দিলেন। সন্ত্রাসের একশেষ! মনে পড়ে, ইরাক যুদ্ধের কালে সারা বিশ্বকে আকাশপথে তোলা ছবি দেখানো হত, কোথায়

কোথায় কতশত ভয়ংকর, গোপন 'জৈব অস্ত্র' ('বায়োলজিকাল ওয়েপন্স') লুকনো আছে! তা দেখে আর ভাবগম্ভীর বাণী শুনে অনেকেই তখন রাগে আর ঘৃণায় অস্থিরমনা। সেই অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে পুরো একটা দেশকে ধূলিকণায় পর্যবসিত করা হয়ে গেল। পরে জানা গেল, প্রমাণও হল যে অমন কোনও অস্ত্রের নামগন্ধও ছিল না। কাণ্ডজ্ঞান লোপের অমন নমুনা আমাদের ভুরিভুরি। ঠিক তেমনই দেখা গেল, ভাইরাস নিয়ে মডেলের প্রাসাদগুলো একে-একে মুখ থুবরে পড়েছে। আমরা দেখলাম, ভাইরাসের মেধাশক্তির কাছে আমাদের মধ্যমেধার চূড়ান্ত মুর্ছা। অথচ মধ্যমেধাবীরা তো বিদ্বানই, বিদ্যেবোঝাই। বিপদ এই যে, 'সাঁতার বিনা জীবনটা যে ষোল আনাই মিছে' এই কথাটা আজও শিখলেন না। শেখাবে তো লোকসাধারণ, সেই প্রাঙ্গণে তো যাওয়াই হয় না। তাই 'মডেলিং' এল, 'মডেলিং' গেল, 'ননসেন্স ইন ননসেন্স আউট'।

এইভাবে প্রায় এক বছর আমরা এক অতুলনীয় পরিস্থিতির মধ্যে কাটিয়ে দিলাম; একেই কি 'সুররিয়াল' বলে? জানি না। তবে এটা জানি, বুঝিও যে, ঘরবন্দি, কর্মহীন হয়ে আমরা যখন প্রহর গুনছি, ডাক্তাররা যখন কোভিড রোগ সারাতে হন্যে হয়ে 'পরশপাথর' খুঁজছেন, তখন দিনেদুপুরে লুট চলছে, কর্পোরেট লুট, হাসপাতাল থেকে পাতাল পর্যন্ত বর্বর মুনাফাবৃত্তি।

এক কোভিড-১৯-এই আমাদের এমন হিজিবিজি অবস্থা। আমরা ভেবেও দেখছি না যে, সামনে আসছে কোভিড-২১, ২৩ ইত্যাদি নানান্ নামের বাহারে। তখন আমরা কী করব। কোথায় দাঁড়াব? আমাদের এই হেঁটমুণ্ড ঊর্ধপদ অবস্থা যে ইতিহাসের রসদ হয়ে থাকল। এর পর আগামী প্রজন্ম যদি আমাদের নিয়ে মস্করা করে সেটা কি দোষের হবে?

✱✱✱✱

তাই মনে হয়, এই করোনাকালে যা যা ঘটে গেল তার পিছনে একটা ছক আছে, একটা ডিজাইন। সরকারকে কেউ নির্বোধ বলতে পারেন, কেউ ভাবতে পারেন এসব সরকারের পাগলামি। কিন্তু মনে হয়, এ স্রেফ নির্বুদ্ধিতা

বা পাগলামি কোনওটাই না; বরং বলা যায়, এসব সেয়ানা পাগলের কাজ। অর্থাৎ পাগলামি হলেও তার পিছনে একটা ছক আছে, যাকে বলে, 'মেথড ইন ম্যাডনেস'। একটা দৃশ্যপট একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলেই সেটা বোঝা যায়। দৃশ্যপট হল:

ভাইরাস সংক্রমণের ভয় (বা অজুহাত) দেখিয়ে তামাম জনমানুষের মুখ মুখোশে ঢেকে ফেলা হল, তারা নির্বাক। সকলকে গৃহকোণে বন্দি করে রাখা গেল, বেরলেই নাকি কোভিড-এ নির্ঘাত মৃত্যু। স্বাস্থ্যকর্মীরা 'হাতে বন্দুক পায়ে বন্দুক' আর শিরস্ত্রাণ নিয়ে কোভিড তাড়ানোর যুদ্ধে নামলেন; তাঁদের সামনে অন্য কাজগুলো গুরুত্ব হারাল। যেকোনও জনসমাগম নিষিদ্ধ হয়ে গেল। আর সেই সুযোগে, একমুঠো জনবিরোধী আইন জারী করা হয়ে গেল, নাগরিক স্বাধীনতা লোপাট হয়ে গেল। চোখের সামনে আমরা দেখলাম কাজ হারানো, রোজগার হারানো, ভুখা দিনমজুরদের ঘরমুখো মিছিল। জাতীয় অর্থনীতির যে-পতন ঘটল তার তুলনা নেই, অথচ আমাদের অর্থনীতি নাকি বটবৃক্ষ!

এদিকে আমরা তো ভাইরাস-এর বিরুদ্ধে যারপরনাই ঘৃণা সঞ্চয় করছি। তারপর দেখছি, নিজেরাই যেন বেকায়দায়। অন্তত ২৩ রকম ওষুধবিসুধ দিয়ে কোভিড-এর চিকিৎসা চালিয়ে এখন শুনছি, কোনওটারই নির্ভরযোগ্যতা নেই! ২০১৯-এর শেষের দিকে 'হু' একটা নির্দেশিকা প্রচার করেছিল, তাতে বলা ছিল অতিমারী হলে কী কী আমাদের করণীয়। সেই মোতাবেক সবই আমরা করেছি। তখন খেয়াল করিনি, এখন দেখছি, ওই নির্দেশিকার একেবারে নিচে, পরিশিষ্ট হিসেবে বলা ছিল, নির্দেশগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এখন তাহলে কী করা? শুধু একথাই ভাবা যে, এই ক'মাসের কষ্টসাধ্য ব্যায়ামে কার লাভ হল, কারই বা ক্ষতি?

গান্ধীজী বলতেন, সরকার কোনও নীতি তৈরি করলে প্রথমেই দেখতে হবে তাতে প্রান্তিকতম মানুষটার উপকার হবে কিনা। হলে ভাল; কিন্তু না-হলে বুঝতে হবে, ওটা নীতি না, দুর্নীতি। সেই মানদণ্ড সামনে রেখে ভাবতে হবে, অতিমারীর বিরুদ্ধে যে-নীতি আমরা পালন করতে বাধ্য হয়েছি তাতে কার লাভ হল। প্রান্তিক মানুষজনের? না! ছাপোষা গেরস্থদের? না!

ছোট আর মাঝারি ব্যবসাদারদের? না! লাভ হয়েছে কর্পোরেটের, শুধু তাদেরই। তাহলে তারাই 'যোগ্যতম' বলে ধরে নিতে হবে, তাই তাদেরই কেবল বাঁচার অধিকার! সেই অধিকারের কথা তারা কয়েক বছর ধরেই জানাচ্ছিল। বিল গেটস ২০১৫ সাল থেকে জানাচ্ছে, আগামী দিনগুলোতে আমাদের একটার পর একটা অতিমারীর মোকাবিলা করতে হবে। ২০১৮ সালের ২২-শে এপ্রিল একটা সভায় সে জানিয়ে দিল, ছ'মাস পরে আসছে ভয়ংকর এক মহামারী। এখন নাকি আর যুদ্ধাস্ত্র বানানোর সময় না, এখন শুধু টিকা বানানর সময়। করোনা অবশ্য ছ'মাস পরে না, একটু দেরি করেই এসেছে; তবু মনে হয়, বিল সাহেবকে ভবিষ্যদ্রষ্টা ছাড়া কীই বা বলা যায়! এই ভবিষ্যদ্রষ্টাদের ইঙ্গিতেই একটা একটা করে যাবতীয় জাতীয় সম্পদ তাদের দখলে চলে যাচ্ছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে সম্পদের এত বড় হাতবদল এর আগে কখনও হয়নি। এটাই ছক।

তাই মনে পড়ে,

'দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া
অবণী, বাড়ি আছো? ...'

এইভাবে অবণী সমেত আমরা সকলে, যেন আনমনেই শিল্প সভ্যতার 'চতুর্থ' বিপ্লবের নীরব সাক্ষী হয়ে রইলাম।

কার ইঙ্গিতে 'আরোগ্য সেতু' নামে অ্যাপ তৈরি হয়েছিল, ঘরে ঘরে প্রচার হয়েছিল? আমরা জানি না; প্রশ্ন তুলে জানলাম, সরকারও জানে না! তাহলে সরকারের পিছনেও কোনও শাসক দাঁড়িয়ে আছে। সেই অদৃশ্য শাসকের ইঙ্গিতে এবার হয়তো তৈরি হবে টিকা নিয়ে কোভিড মুক্তির ছাড়পত্র। তারই ইঙ্গিতে সম্মতির নির্মাণকার্য চলছে। ভাবখানা এমন যেন আগে টিকা নিতে হবে, নিরাপত্তার কথা পরে ভাবা যাবে; আর দরকারের কথা এখন তোলাটাই অবান্তর। এখন নতুন জমানা, 'নিউ নর্মাল'! অদৃশ্য শাসক যাকে 'স্বাভাবিক' মনে করবে আমাদেরও তা স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে হবে; এটাই অগ্রগতি, তাই পুরাতনকে নিয়ে ভাববিলাস আর চলবে না।

এখন শুধু টিকাতেই না, খাদ্য এবং খাদ্যবীজেও আমরা পুরোদমে জিন নিয়ে নাড়াচাড়া ('ম্যানিপুলেশন') করব, কেননা ওই সবই চলে যাবে কর্পোরেটের খপ্পরে। জিনচর্চা হল উন্নতির প্রমাণ। গেল শতকের ত্রিশের দশকে হিটলারের জমানায় যখন জিনচর্চার ধুয়ো উঠেছিল, আমরা তখন তার সমালোচনা করে বলেছি, নাৎসিবাদ আর সৌজাত্যবাদ ('ইউজেনিক্স') হল আধুনিক বর্বরতা। না-বুঝেই বলেছিলাম হয়তো, কেননা নাৎসিবাদ যে আমাদেরও মননে। সেই মনন নিয়ে আমরা উন্নতির দামামা বাজাবো, উন্নয়নের কসরত দেখাবো। তাই দারিদ্র্য সীমাটিমা নিয়ে আমাদের নতুন অঙ্ক কষতে হবে, হিসেবনিকেশ পালটে যাবে। 'মন্বন্তরে মরিনি আমরা...', এইসব আহ্লাদী আবৃত্তি আর করতে পারব না, কেননা সাক্ষাৎ মন্বন্তর অবশ্যম্ভাবী। বিশ্বপুঁজির এখন সংকটকাল; আর পুঁজি যে নিজের সংকট জনমানুষের কাঁধে চাপিয়ে দেয় একথা সকলের জানা। তাই উলুখাগড়ার নিধন যে ইতিহাসসিদ্ধ একথাও জানা।

এইভাবে এমন এক সভ্যতায় আমরা প্রবেশ করছি যেখানে শুধুমাত্র কর্পোরেটের একাধিপত্য চলবে; অর্থনীতি, আইন ব্যবস্থা, রাজনীতির চলন এবং সংবাদ মাধ্যম, সবই থাকবে তারই অধীনে। রাষ্ট্রের চার বা পাঁচ স্তম্ভ নিয়ে আমাদের যেসব ধ্যানধারণা ছিল তা পালটে ফেলতে হবে; 'স্বাধীনতা' শব্দটার তেমন ব্যঞ্জনা আর থাকবে না। একে কুৎসিত বলা যায়, কিন্তু কর্পোরেটের কাছে এর চেয়ে সুন্দর, মনোরম অবস্থা আর কিছু নেই।

একেই আমরা বলছি, শিল্প সভ্যতার চতুর্থ পর্যায় বা চতুর্থ শিল্প বিপ্লব। সরকার নিজেও তা গোপন করেনি। সম্প্রতি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় যে-নতুন নীতি আনা হয়েছে তাতে আমাদের কী কী করণীয় আর বর্জনীয় তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লব'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। 'নতুন মানুষ' তৈরি করতে বর্তমান সরকার অমনই বদ্ধপরিকর, কেননা পুরনো ধারণা নিয়ে থেকে গেলে নতুন সভ্যতায় আমরা মানিয়ে নিতে পারব না। কেমন সেই নতুন সভ্যতা?

শিল্প সভ্যতার বিবর্তন হয়, আমরা জানি। বাষ্প শক্তির আবিষ্কারকেই শিল্প সভ্যতার প্রথম পদক্ষেপ বলে ধরা হয়। এর পরে আমরা বিদ্যুৎ শক্তি আবিষ্কার করে এক লাফে পৌঁছে গিয়েছি দ্বিতীয় শিল্প সভ্যতায়। তার পর আমরা এনেছি 'অটোমেশন'; সেটা ছিল তৃতীয় শিল্প বিপ্লব। প্রতিটি সভ্যতায় আমাদের চালচলন, ধরনধারণ, জীবনশৈলী যেমন পালটে গেছে তেমনি পুঁজির চালচলনও পালটে গেছে। 'নিজেকে পালটাও, দুনিয়াটা পালটাও' বলে একটা কথা একসময় খুবই জনপ্রিয় ছিল, বিশেষ করে যুব সমাজের কাছে। এখন মনে হয়, কথাটা বর্ণে বর্ণে মেনেছে বিশ্বপুঁজি; সে নিজের ভোল পালটে দুনিয়ার ভোল পালটে ফেলেছে। এইভাবে আমরা এসেছি নতুন এক সভ্যতায়, যেখানে পুঁজি হয়ে গেল 'ডিজিটাল'।

এই সভ্যতা আমাদের জানাচ্ছে, 'বাস্তব' নিয়ে আমাদের ধারণাও বদলে ফেলতে হবে, কেননা এখন 'ছায়া বাস্তব' ('ভারচুয়াল রিয়েলিটি')-এর যুগ। যে-জমির উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি, বাস্তব এখন সেখানে থাকে না, সে থাকে মেঘের আড়ালে, আমরা বলি 'ক্লাউড'। আমাদের চিন্তাভাবনার গতিপথ, আমাদের মনোবাসনা, গতিবিধি, সবই জমা থাকবে 'ক্লাউড'-এর কাছে। চাইলে আমরা তা দেখে নিতে পারি, তবে তার জন্য ভাড়ার ব্যবস্থা থাকবে। এটা একটা নতুন 'সিস্টেম', তার চাবিকাঠি থাকবে শাসকের হাতে। শাসক আমাদের ততটুকুই জানাবে যতটুকু স্রেফ প্রাণ ধারণের জন্য দরকার, তার বেশি কিছু না। কিন্তু শাসকের গতিবিধি আমরা জানতে পারব না। তার মানে, এ হল একমুখী পথ; আমরা প্রকাশ্যে থাকব, শাসক থাকবে মেঘের আড়ালে।

শাসক তাহলে কে? সে কি সরকার? না! সরকার নিয়ে আমাদের ধারণাও পালটে যাবে। দুনিয়া শাসন করবে তিনটি 'নেশন', - 'গুগল', 'ফেসবুক' আর 'আমাজন'। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে তারাই সরকার 'স্থাপন' করে দেবে, তাই সরকার হয়ে যাবে কোম্পানির সর্বোচ্চ কর্মকর্তার মতো, বলা যায়, 'সি ই ও'। এই নতুন ব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠী সভ্যতাও বলা যায়, তবে

এখন তার নতুন রূপ, নতুন অবয়ব, নতুন চরিত্র। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের কথা আমাদের জানাই, সৃষ্টি থেকে ধ্বংসের কারিগরি তাঁদেরই করতলে। তাঁরাই দেবরাজ ইন্দ্রকে ভারতে পাঠাবেন অসুর কুল ধ্বংসের কাজে। যারা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরোধী তারাই অসুর। ভারতে ইন্দ্রের ভূমিকায় কে বা কারা আমরা টের পাচ্ছি; অন্যান্য দেশেও ইন্দ্ররা আছেন, অন্যান্য দেবগুষ্টিও আছে, তবে সকলেই সৃষ্টি, স্থিতি আর প্রলয় কাণ্ডের দূত।

যে-বিল গেটস-এর কথা আমরা উল্লেখ করেছি সে হল ওই তিনটি 'নেশন'-এর একটির সম্রাট। সে অতি ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যবসাদার, নানান্ খাতে তার লগ্নি; সেই লগ্নির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি তিনটি খাতে: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, 'জি এম' ফুড/বীজ।

অতএব, শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ আর গুণ যে পালটে যাবে তাতে আর সন্দেহ কী? ইস্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার 'ছায়া বাস্তব' রূপ দেখে আমাদের এলিট সমাজ পুলকিত হয়েছে, কেননা এটা নাকি উন্নয়নের আর এক ধাপ। এই পুলক তাদের নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে মানানসই বটে; ভদ্র সমাজে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই শোনা গেল, পশ্চিমবাংলায় একজন মাত্র উপাচার্য এই নির্বুদ্ধিতার সমালোচনা করেছেন। আর যাঁরা জনস্বাস্থ্য নিয়ে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকেন তাঁরা চোখের সামনে দেখছেন, ধ্বংসের উপাখ্যান। এমনই হওয়ার ছিল। শিল্প পুঁজি, সে যে রূপেই থাক না-কেন, সে যে জনস্বাস্থ্যের প্রতি বিরূপ থাকবে একথা বহুকাল আগেই প্রামাণ্য তথ্য আর তত্ত্ব সহযোগে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, মহামতী ফ্রেডারিক এঙ্গেলস আর প্রবাদপ্রতিম ডাক্তার রুডলফ ভির্কো। সুতরাং এই নতুন সভ্যতায় জনস্বাস্থ্য অবেহেলিত, বিপর্যস্তই থাকবে। তার প্রখর নমুনা গত কয়েক মাসেই বোঝা গেল। বাকি থাকল, জিনেটিক্স। খাদ্য থেকে শরীরচর্চা, সর্বত্র তারই আয়োজন চলছে।

কিন্তু এ'রকম একটা ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে আমরা এলাম কীভাবে? তাহলে কি বলতে হবে, কর্পোরেট বা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এবং সরকারের গতিবিধি আমরা কিছুই টের পাইনি, কেননা ঘুমের ঘোরে ছিলাম?

মনে হয়, ঠিক তাই, আমরা মোহগ্রস্ত ছিলাম। তিন-তিনটে শিল্প সভ্যতা আমরা পার করে এসেছি; কিন্তু সত্যিই কী পেয়েছি? পেয়েছি বৈভব। স্বস্তি পাইনি, বিজ্ঞতাও পাইনি; তাই সংকটের পদধ্বনিও শুনতে পাইনি। আমরা 'উন্নয়ন'-এর মোহে অন্ধ ছিলাম, আজও আছি; তাই মাটির স্পর্শ ছেড়ে ছায়া বাস্তবকে প্রণাম করতে চাই। কর্পোরেটের মনোহর মূর্তি দেখতে আমাদের প্রাণ মন ব্যাকুল হয়ে যায়। যেন 'মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর, নমো নমো...'! আমাদের এই মনস্খলন হঠাৎ ঘটেনি; সময় লেগেছে অন্তত কুড়ি বছর। আমাদের সার্বিক অন্ধত্ব এমনই যে গত কুড়ি বছরে চোখের সামনে নতুন যা দেখেছি তাকেই মনে হয়েছে, উন্নয়ন! কার উন্নয়ন, কার অবনমন এসব কথা ভাববার ফুরসৎ পাইনি। উন্নয়ন তত্ত্বের এই 'গামলাতে ফুটো ছিল', তা টের পাইনি। আমাদের 'ভুল চাওয়া নিয়ে গেছে ভুল সিন্ধু পারে'।

অতএব, যা ঘটেছে, ঘটে চলেছে তা আমাদের মোহগ্রস্ততার পরিণাম। এইভাবে আমাদের 'অপ্রতিভ গোচারণ' যেন শেষ হচ্ছে এক 'মহীয়সী কৌতুকে'! মানব বিবর্তনে হোমনিড থেকে হয়েছিলাম, হোমো ইরেকটাস; সেখান থেকে হয়েছিলাম, হোমো সেপিয়েন্স, মানে 'বিজ্ঞ' মানুষ। কিন্তু যে-প্রজাতি নিজেরাই নিজেদেরকে বিজ্ঞ বলে পরিচয় দেয় তার পরিণতি হল, হোমো প্যাথেটিকাস! মনে হয়, এই নিদারুণ বিবর্তনই আমাদের নিয়তি।

✱✱✱✱

তবে একই সঙ্গে মনে হয়, এরও একটা 'অ্যান্টিথিসিস' আছে; চোখ খোলা রাখলে তাকেও স্পষ্ট দেখা যায়।

একদিকে আমরা যেমন অপার নির্বুদ্ধিতা আর এলিট মানুষজনের বিচ্ছেদ-বিলাস দেখেছি, তেমনি অপরদিকে দেখেছি মিলনপিয়াসী লোকসাধারণ। নিষেধ আর চোখরাঙানি সত্ত্বেও জনসমাগম আটকানো যায়নি। লকডাউন-এর মধ্যেই হয়েছে বিধ্বংসী 'আমপান'। দলে দলে যুবক-যুবতী বেরিয়ে পড়েছে বিপর্যস্ত মানুষের হাত ধরে দাঁড়াতে। করোনার ভ্রুকুঞ্চন তাদেরকে ঘরে বেঁধে রাখতে পারেনি। এই মুহূর্তে দেখছি, হাড় কাঁপানো শৈত্য

প্রবাহের মধ্যেও লক্ষ কৃষিজীবীর মেলবন্ধন। কোথায় করোনার আতঙ্ক, কোথায় টিকা নিয়ে আকুলতা? চোখ সার্থক হচ্ছে, মনও। মনে হচ্ছে, এক অন্যরকম সভ্যতার ডাক যেন শুনতে পাচ্ছি। কৃষিকাজকে আমরা যতই হেলাফেলা করি না কেন, সেখানেই যেন এই দেশের জিয়নকাঠি লুকানো আছে। সেই কৃষিবাস্তবের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে গিয়ে সরকারও হতবুদ্ধি, বাক্যহারা। জনমানুষ যেন কর্পোরেটকে শাসিয়ে বলছে, 'এভাবে নয়, এভাবে ঠিক হয় না...'!

এই 'অ্যান্টিথিসিস' আমাদের জানাচ্ছে, সংকট ঠিক কোথায়। করোনার কোন টিকা আমাদের পছন্দ, এটা কোনও সংকট না। আমাদের মনে আছে, পোলিও টিকার দুই আবিষ্কারক কোনও 'পেটেন্ট' নেননি, বিশ্বমানবের দরবারে তা উৎসর্গ করেছিলেন। তেমন মানবদরদি বিজ্ঞানী হয়তো আজও আছেন। কিন্তু না-থাকলেও, টিকা দামি হবে নাকি সস্তা এটাও সংকটের কারণ না। তেমনি, একটা ভাইরাসের আগমণ একটা জাতির জীবনে সর্বগ্রাসী কোনও সংকট হতে পারে না। সংকট এখন অন্যখানে, অন্য এক পছন্দের সংকট, -

- আমরা কি গণতন্ত্র চাই, নাকি কর্পোরেটের আধিপত্যই মেনে নেব?
- আমরা কি 'নিউ নর্মাল' মেনে নিয়ে এক-একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে যাব, নাকি স্পর্শকাতর, স্নেহকাতর, দর্শনকাতর থাকব?

যুদ্ধই যদি করতে হয় তাহলে বরং কর্পোরেটের আধিপত্যই হবে আমাদের বর্শামুখ। সেই যুদ্ধে আমাদের অস্ত্র হবে, কাণ্ডজ্ঞান আর জনবিজ্ঞতা। সিন্ধু নদ যখন তার গতিপথ পালটালো তখন জনবিজ্ঞতাই ছিল আমাদের একমাত্র আশ্রয়। আজ যেসব মজুর দম্পতি পায়ে হেঁটে ভাতিণ্ডা থেকে ভুবনেশ্বরে, হরিয়ানা থেকে হুগলিতে ফেরেন তাঁরা বেঁচে থাকেন শুধু কাণ্ডজ্ঞানের ভরসায়। তাঁরা আমাদেরও একমাত্র ভরসাস্থল। তাই আমাদের মাটির কাছে ফিরে যেতেই হবে। মেঘের আড়ালে থাকা কর্পোরেটকেও মাটিতে নামিয়ে আনা চাই। আমরা সভ্যতা নিয়ে বড় বেকায়দায় পড়েছি, সত্যি।

বিজ্ঞান নিয়েও তাই, কেননা এক ভাইরাস সংক্রমণ আমাদের দেখিয়ে দিল, বিজ্ঞানের ব্যাভিচার আমাদের কোন অসভ্যতার গুহায় নিয়ে যেতে পারে।

✷✷✷✷

তাই আবার আমাদের তিন সত্যিতে ফিরে যেতে হবে:

- সভ্যতা মানে, দীর্ঘ আয়ুর ভার বয়ে যাওয়া না; ভারমুক্ত জীবনই সভ্যতার শর্ত;
- সভ্যতা মানে, জিজ্ঞাসার জন্মভূমি, আর জিজ্ঞাসাই বিজ্ঞান;
- বিজ্ঞান কোনও গুহ্য, গূঢ় মন্ত্রবিদ্যা না, কোনও কঠোর নিয়মকানুনের শক্ত বাঁধন না।

বিজ্ঞান হল পাখির ডানার মতো, ডানা তার অহংকার। পাখি ওড়ে; সে জানে যে কোনওদিন সে দিগন্ত পার হয়ে যেতে পারবে না। তবু সে তার অহংকার নিয়ে ওড়ে। বিজ্ঞান আমাদের কাছে ঝর্ণার মতো। ঝর্ণার জলে কেউ স্নান করে, কেউ তৃষ্ণা মেটায়, আবার কেউ কুলকুচিও করে। বিজ্ঞান পত্রিকাগুলোতে গত কয়েক মাসে করোনা বিষয়ে যত রচনা প্রকাশিত হয়েছে, তা তুলনারহিত। তাতে এটাই প্রমাণিত হল যে এখন কুলকুচির যুগ। কিন্তু যুগচরিত্র কেমন হবে তা আমরা গুটিকয় কর্পোরেটের স্বার্থের উপর ছেড়ে দেব না; আমাদের যুগ আমরাই তৈরি করে নেব। তাই আমরা বরং ঝর্ণার জলে স্নান করি, একটু তৃষ্ণা মেটাই। আর মাটিতে কান পেতে শুনি, সে যেন আমাদের কিছু বলতে চায়... বুঝি বলতে চায়,

‘আমার কাছে এখনো পড়ে আছে
তোমার প্রিয় হারিয়ে যাওয়া চাবি
কেমন করে তোরংগ আজ খোলো?...
অবান্তর স্মৃতির ভিতর আছে
তোমার মুখ অশ্রু-ঝলোমলো
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কি না?’

তথ্যসূত্র –

- Dr Karina Reiss, Dr Sucharit Bhakdi. Corona – *False Alarm? Facts and Figures.* Chelsea Green Publishing, USA. September, 2020. (তথ্যের ভাণ্ডার খুঁজতে হলে এই একটি বই যথেষ্ট)
- Jon Turney. *Beyond cell wars.* 28 March, 2016. https://aeon.co/essays/why-we-should-guard-against-military-notions-of-immunity.
- K. Park. *Park's Textbook of Preventive and Social Medicine.* Banarsidas Bhanot. Ed 25th, 2019.
- Megan O'Driscoll, Gabriel Ribeiro Dos Santos, Lin Wang, Derek A. T. Cummings, Andrew S. Azman, Juliette Paireau, Arnaud Fontanet, Simon Cauchemez & Henrik Salje. *Age-specific mortality and immunity patterns of SARS-CoV-2.* Nature. Published online: 2 November 2020. www.nature.com.
- Paul Farmer. *Fevers, Feuds and Diamonds. Ebola and the Ravages of History.* Farrar, Straus and Giroux. November, 2020.
- Richard Horton. *Offline: Covid-19 is not a Pandemic.* Vol. 396, September 26, 2020.
- করোনার গ্লোবাল তথ্য – https://www.worldometers.info/coronavirus/
- এ ছাড়াও নানান্ তথ্য অন্তর্জালে ছড়ানো আছে, কৌতূহলী পাঠক তা দেখে নিতে পারেন।